ইউনিট ১৮

মানব জীবন বৈচিত্র - ১

ভূমিকা

বিশ্বসৃষ্টির কৌশল এবং তার অতীব সুনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়তে হয়। মানবদেহের গঠনপ্রণালী ও তার অঙ্গবিশেষের কার্যকারিতার কথা চিন্তা করলেও আমরা অভিভূত হই। মনে হয়, এ সৃষ্টির পিছনে কোনো এক মহা-জ্ঞানময় শক্তি না থাকলে মানবদেহের ন্যায় একটি জটিল পূর্ণাঙ্গ দেহ তৈরি করা সম্ভব হতো না। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমরা দেহকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আহার ও পান করি। তা হতে দেহ নিজকে রক্ষা করার উপযোগী দ্রব্য কিভাবে গ্রহণ করে এবং শেষে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ কিভাবে মূত্রদ্বার, মলদ্বার ও লোমকূপ পথে বের করে দেয়, এটা ভাবলে বিশ্ব-স্রষ্টার মানবদেহ সৃষ্টির অপূর্ব কৌশল স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষ কেবলমাত্র প্রাণিজগত নয়, সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব। বুদ্ধিমত্তার জন্য পৃথিবীতে সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আর মানুষের এ বুদ্ধিমত্তার জন্য দায়ী মূল অঙ্গ হল মস্তিষ্ক। এর পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং এদের সমন্বিত কার্যপ্রণালী মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সহায়তা করেছে।

অন্যান্য বহুকোষী জীবের ন্যায় মানুষও এককোষী ভ্রূণ অবস্থা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি পেয়েছে। আকার, আকৃতি ও কার্যকারিতার দিক থেকে একই প্রকৃতির কিছু কোষ একত্রিতভাবে টিস্যু গঠন করে। বিভিন্ন টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত হয় অঙ্গ এবং কয়েকটি অঙ্গ মিলিতভাবে গঠন করে তন্ত্র। পরিশেষে বিভিন্ন তন্ত্রের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীব। এ ইউনিটে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলোর মধ্যে কঙ্কালতন্ত্র, পেশীতন্ত্র, পৌষ্টিকতন্ত্র ও রক্তসংবহনতন্ত্র আলোচনা করা হলো।

পাঠ ১৮.১

কঙ্কালতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কঙ্কালতন্ত্রের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- এর গঠন ও কাজ লিখতে পারবেন;
- কঙ্কালের যত্নে করণীয় পদক্ষেপ উল্লেখ করতে পারবেন;
- কঙ্কালতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও অসুবিধাসমূহ উল্লেখসহ এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিরূপণ করতে পারবেন।

কঙ্কালতন্ত্র

অস্থি ও তরুণস্থি দ্বারা গঠিত যে তন্ত্র দেহের মূল কাঠামো গঠন করে এবং অভ্যন্তরীণ অত্যাবশ্যকীয় ও কোমল অঙ্গসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্র বহি:কঙ্কাল ও অন্ত:কঙ্কাল নিয়ে গঠিত। অন্ত:কঙ্কাল বাইরে থেকে দেখা যায় না। বহি:কঙ্কাল বলতে নখ, দাঁত, লোম, চুল প্রভৃতিকে বুঝায়। অপরদিকে দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো বা অন্ত:স্থ কঙ্কালই অন্ত:কঙ্কাল। অস্থি ও তরুণাস্থি দিয়ে আন্ত:কঙ্কাল গঠিত।

কঙ্কালের গঠন

অস্থি ও তরুণাস্থি দিয়ে কঙ্কাল গঠিত।

অস্থি বা হাড়

অস্থিকে একটি নিরেট অংশ বলে মনে হয়। আসলে তা নয়, অস্থি হল এক ধরণের জীবন্ত টিস্যু। এ টিস্যু শক্ত ও স্পঞ্জজাতীয় পদার্থে গঠিত। অস্থির ভিতরে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যুক্ত থাকে অস্থিমজ্জা, আর বাইরে থাকে অস্থি আবরণী স্তর। অস্থি মজ্জার শতকরা ৪০ ভাগ জৈব পদার্থ ও বাকী ৬০ ভাগ অজৈব পদার্থ। অজৈব অংশ ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় অস্থিতে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ পানি থাকে। অন্যান্য অঙ্গের মত প্রতিটি অস্থিতে রক্ত, লসিকা ও স্নায়ু সরবরাহ থাকে।

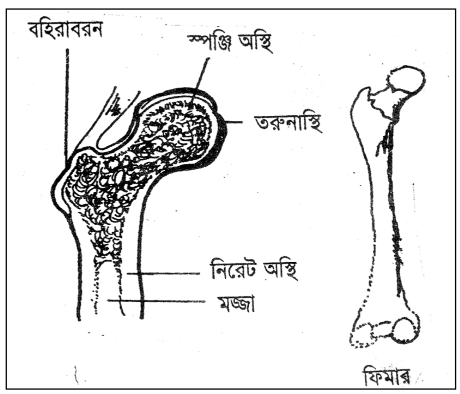

চিত্র ১৮.১-১ : একটি লম্বা অস্থি (লম্বচ্ছেদ)

একটি সাধারণ লম্বা অস্থির লম্বচ্ছেদে নিচের অংশগুলো দেখা যায়-

তরুণাস্থি : একটি তরুণাস্থি টিস্যু দিয়ে গঠিত এবং অস্থির প্রান্তভাগে নীলাভ আবরণের মত দেখা যায়। তরুণাস্থি অস্থি নড়াচড়া ও অস্থিসন্ধি গঠনে সাহায্য করে। তরুণাস্থির উপরিভাগ সাধারণত মসৃণ থাকে। নবজাত শিশুর অস্থি তরুণাস্থি দিয়ে গঠিত, বয়স বাড়ার সাথে সাথে এসব তরুণাস্থি শক্ত অস্থিতে পরিণত হয়।

স্পঞ্জি অস্থি : অস্থির এ অংশটুকু স্পঞ্জের মত ছিদ্রযুক্ত। অস্থির দু'প্রান্ত প্রধানত স্পঞ্জি অস্থি দিয়ে তৈরি।

লোহিত অস্থিমজ্জা : অস্থির কেন্দ্রে অবস্থিত নলাকার গহ্বর যে টিস্যু দ্বারা পূর্ণ থাকে তাকে অস্থিমজ্জা বলে। অস্থিমজ্জা লাল ও হলুদ বর্ণের হতে পারে। লোহিত অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত কণিকা তৈরি হয়।

অস্থি আবরণী : অস্থির বাইরে একটি মজবুত ও পাতলা আবরণ শক্তভাবে আটকে থাকে, একে বহিরাবরণ (Periosteum) বলে। বহিরাবরণের ভিতর দিয়ে রক্তনালী ও স্নায়ু যাতায়াত করতে পারে। মাংসপেশী ও পেশীবন্ধনী এর উপর এসে আটকায়। ফলে অস্থি সঞ্চালন সম্ভবপর হয়।

নিরেট অস্থি : নিরেট অস্থি অস্থির সবচেয়ে কঠিন ও শক্ত অংশ। এখানে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ফসফেট ও অন্যান্য খনিজ লবণ জমা হয়ে শক্ত হয়।

মানবদেহের অস্থিগুলো বিভিন্নভাবে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে অন্তঃকঙ্কাল তৈরি করেছে। দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে। প্রতিটি সন্ধির অস্থিপ্রান্তগুলো এক রকম স্থিতিস্থাপক রজ্জুর মত বন্ধনী দিয়ে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে, ফলে অস্থিগুলো সহজে সন্ধিস্থল হতে বিচ্যুত হতে পারে না। পেশীর সংকোচন অস্থি টেনে নড়াচড়া করাতে সক্ষম হয়। কোনো কোনো অস্থিসন্ধি একেবারে অনড়, যেমন- করোটির অস্থিসন্ধি ও শ্রেণীচক্রের সন্ধি। কিছু অস্থিসন্ধি আবার সামান্য নড়াচড়া করতে পারে, ফলে আমরা দেহকে সামনে, পিছনে ও পাশে বাঁকাতে পারি, যেমন- মেরুদন্ডের অস্থিসন্ধি। এগুলো ছাড়া দেহে প্রায় ৭০টিরও বেশি সহজে সঞ্চালনক্ষম বা সাইনোভিয়াল সন্ধি আছে। সাইনোভিয়াল সন্ধিতে, সন্ধিস্থলে একটি অস্থির একদিকের বলের মত গোল অংশটি অন্য অস্থির কোটরে এমনভাবে স্থাপিত হয় যে, অস্থির সকল দিকে চলাচল সম্ভব হয়; এক্ষেত্রে অস্থি দুটি তন্তুময় ঝিল্লি বা লিগামেন্ট দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের সন্ধিতে সাইনোভিয়াল রস নামক এক প্রকার তৈলাক্ত রস থাকায় অস্থি দুটি সহজে নড়াচড়া করতে পারে। হাতের কনুই, হাটু ও কাধের সন্ধি সাইনোভিয়াল সন্ধির অন্তর্ভুক্ত।

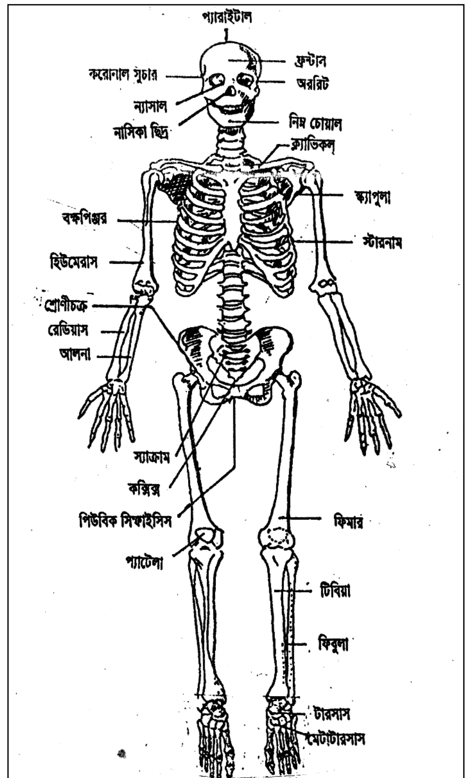

চিত্র ১৮.১-২ : কঙ্কালতন্ত্র

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ

কঙ্কালতন্দ্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো হয়ে থাকে। যথা-

দেহ কাঠামো : কঙ্কালতন্ত্র দেহের কাঠামো গঠন করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে। এটা নিচের অঙ্গকে উপরের অঙ্গের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখে।

রক্ষণাবেক্ষণ : মস্তিষ্ক করোটিতে, মেরুরজ্জু মেরুদন্ডে এবং হৃদপিন্ড, ফুসফুস ও অন্যান্য নরম অঙ্গগুলো বক্ষপিঞ্জরে নিরাপদভাবে থাকে। দেহের সকল পেশী এবং নরম অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহ-কাঠামোতে আটতে থাকে।

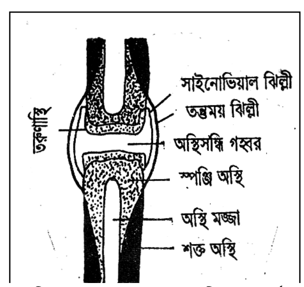

চিত্র ১৮.১-৩ : একটি আদর্শ সাইনোভিনয়ল সন্ধি

নড়াচড়া : হাত, পা, স্কন্ধচক্র ও শ্রেণীচক্র নড়াচড়া করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন অস্থির সাথে পেশীসমূহ আটকে থাকে। ফলে পেশী সংকোচন প্রসারণ সম্ভব হয়। আর পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে অস্থিসমূহ সচল হয় এবং মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি চলাচল করতে পারে।

লোহিত রক্ত কণিকা গঠণ : কতকগুলো অস্থির লাল অস্থিমজ্জা হতে লোহিত রক্ত কনিকা তৈরি হয়।

সঞ্চয় : বিভিন্ন খনিজ লবণ (যেমন : ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস) সঞ্চয়ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

কঙ্কালতন্ত্রের যত্ন

অস্থির গঠন প্রকৃতি আমাদের দৈনন্দিন কার্যকারীতার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে আমরা যেভাবে বসি ও দাঁড়াই সে অনুসারে মেরুদন্ডের আকার, আকৃতি পরিবর্তিত হয়। গুটি সুটি মেরে বসা অথবা সামনের দিকে ঝুকে হাঁটা ও কাজ করা ভালো নয়। দীর্ঘদিন এভাবে চলাফেরা ও কাজ করলে মেরুদন্ড বেকে যায় ও দেহগঠনে বিকৃতি ঘটে, ফলে পেশী ও স্নায়ুগুলো ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এছাড়া দেহ কাঠামো সুন্দর ও সুঠাম রাখতে দৈনিক নিয়ম অনুসারে হালকা ব্যায়াম করা অপরিহার্য।

কঙ্কালতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও অসুবিধাসমূহ এবং তাদের প্রতিকার

নিচে কঙ্গালতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ ও অসুবিধাসমূহ ও প্রতিকারসহ আলোচনা করা হলো-

রিকেটস : শরীরে ভিটামিন "ডিঃ এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হলে বাড়ন্ত শিশুদের রিকেটস হয়। এ রোগে শিশুরা ঠিকমতো বাড়তে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে অস্থি বাঁকা হয়ে যায়।

প্রতিকার : সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং উপযুক্ত পরিচর্যা দ্বারা এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

আরথ্রাইটিস বা গেঁটেবাত : এটা এক ধরণের বাত রোগ। এ রোগে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ বা ব্যথা হয়। অস্থিসন্ধিগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং সহজে নড়াচড়া করা যায় না। স্যাঁতস্যাঁতে বাসস্থান ও আবহাওয়ায় বহুদিন ধরে বাস করলে এ রোগ হতে পারে।

প্রতিকারঃ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা দ্বারা এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

পোলিও : এটি একটি ভাইরাস জনিত রোগ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট শিশুরা এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের ফলে শিশুদের হাত পা পঙ্গু হয়ে যায় বা বাঁকা হয়ে যেতে পারে।

প্রতিকার : শিশুদের নিয়ম অনুসারে পোলিও টিকা খাওয়ালে সারা জীবনের জন্য এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বোন টি বি (Bone T.B) : এটি অস্থির টিউবারকিউলোসিস রোগের সংক্ষিপ্ত রূপ। এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে অস্থি আস্তে আস্তে শুকিয়ে চিকন হয়ে যেতে পারে।

প্রতিকার : স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস এবং যথাসময়ে চিকিৎসার দ্বারা এ রোগ সেরে যায়।

অস্থির স্থানচ্যুতি ও অস্থি ভেঙ্গে যাওয়া : হঠাৎ প্রচন্ড আঘাত বা মাত্রাতিরিক্ত চাপে কোনো অস্থি সঠিক স্থান থেকে সরে যেতে পারে, ভেঙ্গে যেতে পারে বা ফেটে যেতে পারে। অস্থির স্থানচ্যুতির ফলে পেশি এবং লিগামেন্টের ক্ষতি হয়।

প্রতিকার : অস্থি ভেঙ্গে গেলে বা স্থানচ্যুতি ঘটলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অতিদ্রুত অস্থি চিকিৎসককে দেখাতে হবে।

সারসংক্ষেপ

- অস্থি ও তরুনাস্থি দ্বারা গঠিত যে তন্ত্র দেহের মূল কাঠামো গঠন করে এবং অভ্যন্তরীণ অত্যাবশ্যকীয় ও কোমল অঙ্গসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।
- অস্থি ও তরুণাস্থি দিয়ে কঙ্কাল গঠিত।
- মানবদেহের অস্থিগুলো বিভিন্নভাবে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে অন্তঃকঙ্কাল গঠন করেছে। দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে।
- কঙ্কালতন্ত্রে বিভিন্ন রোগ হতে পারে, এদের মধ্যে রিকেটস, গেঁটেবাত, পোলিও, অস্থির টিউবারকিউলোসিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অস্থিমজ্জায় শতকরা কতভাগ জৈব পদার্থ থাকে?

ক. ৬০ ভাগ　খ. ৫০ ভাগ　গ. ৪০ ভাগ　ঘ. ৩০ ভাগ

২. কঙ্কালতন্ত্র কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার　খ. তিন প্রকার　গ. চার প্রকার　ঘ. পাঁচ প্রকার

৩. একটি লম্বা অস্থির লম্বচ্ছেদে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

ক. দুইটি অংশ　খ. তিনটি অংশ　গ. চারটি অংশ　ঘ. পাঁচটি অংশ

৪. নিচের কোনটি অচল অস্থিসন্ধি?

ক. কনুই　খ. করোটি　গ. হাটু　ঘ. মেরুদন্ড

৫. রিকেটস কোন বয়সে দেখা দেয়?

ক. বয়স্ক মহিলাদের　খ. বয়স্ক পুরুষদের　গ. বাড়ন্ত শিশুদের　ঘ. মধ্যবয়সে।

পাঠ ১৮.২

অস্থিবিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাথার খুলির গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মেরুদন্ডের গঠন ও কাজ বলতে পারবেন;
- উর্ধ্বাঙ্গের গঠন ও কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- নিম্নাঙ্গের গঠন ও কাজ আলোচনা করতে পারবেন।

অস্থিবিন্যাস

মানবদেহে সর্বমোট ২০৬ খানা অস্থি আছে। এ অস্থিগুলো পরস্পর সংযুক্তির ফলে মানুষের অন্ত:কঙ্কাল গঠিত। অস্থি বিন্যাস অনুযায়ী অন্ত:কঙ্কালকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মাথার খুলি বা করোটি, মেরুদন্ড, উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ।

মাথার খুলি

মেরুদন্ডের প্রথম কশেরুকার উপর অবস্থিত ২৯টি শক্ত অস্থির সমন্বয়ে গঠিত গোলাকার ফাঁপা প্রকোষ্ঠকে মাথার খুলি বা করোটি বলে। করোটির অস্থিগুলির ধার খাজকাটা। এর ফলে অস্থিগুলো বেশ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। করোটির মধ্যেই দেহের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ মস্তিষ্ক সুরক্ষিত রয়েছে। মাথার খুলির পশ্চাদভাগের নিুদেশে দেড় ইঞ্চি পরিমিত ছিদ্র পথে মস্তিষ্ক হতে মেরুদন্ডের অস্থির মধ্যে দীর্ঘ রজ্জুর ন্যায় সাদা মজ্জা চলে গেছে। একে মেরুমজ্জা (spinal) বলে।

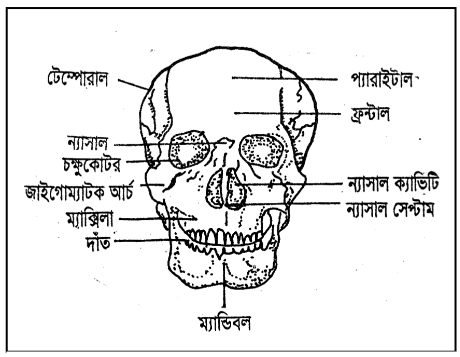

চিত্র ১৮.২-১ : মাথার খুলি

মাথার খুলির সম্মুখভাগে মুখমন্ডল অবস্থিত। চোখ, কান, নাক ও মুখগহ্বর এ মুখমন্ডলেই অবস্থিত। মুখগহ্বরের উপর ও নিচের চোয়ালে দাঁত বসানো থাকে।

কাজ : দেহের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ মস্তিষ্ক মাথার খুলির মধ্যে সংরক্ষিত।

মেরুদন্ড

সম্পূর্ণ মেরুদন্ডটি একটি মাত্র অস্থি দ্বারা গঠিত নয়। ৩৩ খানা অস্থিখন্ড দ্বারা মেরুদন্ড গঠিত। মাথার খুলির পিছন ও নিম্নভাগ থেকে শুরু করে দেহের পৃষ্ঠ রেখা বরাবর মেরুদন্ড অবস্থিত। মেরুদন্ডে অবস্থিত অস্থিগুলোর প্রতিটি খন্ডকে কশেরুকা (vertebra) বলে।

পাশে একটি আদর্শ কশেরুকার চিত্র দেওয়া হলো লক্ষ্য করুন। এতে সেন্ট্রাম নামক হাড়ের একটি অংশ আছে, এটাই কশেরুকার মূলদেহ। সেন্ট্রাম অনেকটা স্থিতিস্থাপক একটি তরুণাস্থির মাধ্যমে পরবর্তী কশেরুকাকে সংযুক্ত করে। এ সেন্ট্রামের উপর ভর করে শরীর খাড়া থাকে। প্রতিটি কাশেরুকায় একটি নলাকার ছিদ্র থাকে। একে নিউরাল নালী (neural canal) বলে। সমস্ত কশেরুকার নিউরাল নালীসমূহ একটি অবিচ্ছিন্ন নালী গঠন করে। নিউরাল নালীর মধ্যে মেরুমজ্জা থাকে।

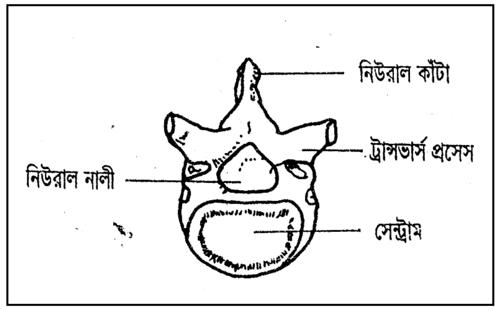

চিত্র ১৮.২-২ : একটি আদর্শ কশেরুকা

কাশেরুকার পার্শ্বীয় বর্ধিত অংশ ট্রান্সভার্স প্রসেস (transverse process) এবং নিউরাল স্পাইন (neural spine)-এ পিঠের পেশী আটকানো থাকে এবং ধড়কে পাশে ও পিছনে বাঁকাতে সাহায্যে করে। অন্যান্য পেশীগুলো মেরুদন্ডের সামনের দিকে কাজ করে।

অবস্থান অনুসারে কশেরুকাগুলোকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যথা-

গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা : গ্রীবাদেশে অবস্থিত কশেরুকাগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এ কাশেরুকার সংখ্যা ৭টি।

বক্ষদেশীয় কশেরুকা : বক্ষদেশীয় কশেরুকার সংখ্যা ১২টি। এরা বক্ষদেশে অবস্থিত। এদের সেন্ট্রাম স্থূল। নিউরাল স্পাইন অপেক্ষাকৃত লম্বা, বন্দুকের বেয়নেটের মত নিচে নেমে গেছে। ট্রান্সভার্স প্রসেস ছোট।পর্শুকার সংযুক্তির জন্য তাতে ক্যাপিটিউলাম ও টিউবারকিউলাম নামক দুটো ফ্যাসেট থাকে। বক্ষপিঞ্জরে হৃদপিন্ড ও ফুসফুস রক্ষিত থাকে।

কটিদেশীয় কশেরুকা : এ কশেরুকাগুলো কটি তথা নিতম্ব অঞ্চলে অবস্থিত। এদের সংখ্যা ৫টি। এদের গায়ে যেসব পেশী আটকে থাকে তারা নিম্নাঙ্গ ও উর্ধ্বাঙ্গের মাঝে একক সংযোগকারী পেশী। আমরা যখন দেহকে সামনের দিকে বা পেছনের দিকে বাঁকাই তখন প্রধানত : কটিদেশীয় কশেরুকাগুলোই নড়ে।

শ্রোণীদেশীয় কশেরুকা : এদের সংখ্যা ৫টি। এ পাঁচটি কশেরুকা একীভূত হয়ে ত্রিকোণাকার স্যাক্রাম গঠন করে। এর উপরের চওড়া অংশটি ভিত্তি; নিচের সরু অংশটি চূড়া; এবং দুপাশের অংশ দুটি পার্শ্বীয় অংশ।

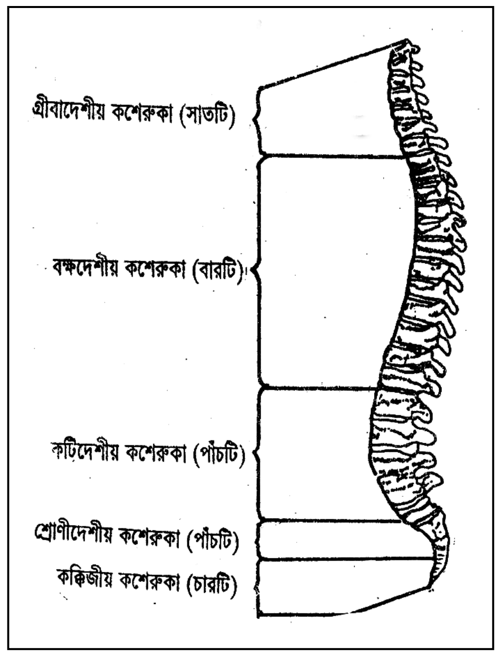

চিত্র ১৮.২-৩ : মানুষের মেরুদন্ড

পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা : মেরুদন্ডের শেষপ্রান্তে অবস্থিত ৪টি কাশেরুকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ কশেরুকাগুলো একত্রে সংযুক্ত হয়ে কক্কিক্স গঠন করে। একে মানুষের পূর্বপুরুষীয় প্রাণির লেজের ক্ষয়িষ্ণু অংশ মনে করা হয়।

মেরুদন্ডের কাজ :

- দেহের ভার বহন করে।
- কশেরুকাগুলোর সংযুক্তির ফলে যে নালীকার সৃষ্টি হয় তাতে মেরমজ্জা অবস্থান করে এবং মেরুদন্ড একে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

- দেহের অঙ্গসংস্থান ও চলাফেরায় সহায়তা করে।

উর্ধ্বাঙ্গ

বক্ষ অস্থিচক্র ও দুবাহু নিয়ে উর্ধ্বাঙ্গ গঠিত।

বক্ষ অস্থিচক্র : মানুষের বক্ষ অস্থিচক্র দুই জোড়া অস্থি নিয়ে গঠিত। এদের একজোড়া ক্ল্যাভিকল ও অন্যজোড়া স্ক্যাপুলা। এটা পেশী দ্বারা বুকের খাচার সাথে যুক্ত তাকে। এ কারণে অস্থিময় এ ঘেরটি দৃঢ় ও স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া করতে পারে।

বাহু : প্রতিটি বাহু নিম্নলিখিত অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

ক. হিউমেরাস : কাঁধ হতে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত একখানা লম্বা হাড় আছে। এটিকে হিউমেরাস বলে।

খ. নিম্নবাহু বা রেডিও আলনা : মোট দুখানা অস্থি নিয়ে নিম্নবাহু গঠিত। এরা কনুই হতে কবজি পর্যন্ত বিস্তৃত। দুটি অস্থির একটিকে রেডিও এবং অপরটিকে আলনা বলা হয়।

গ. মনিবন্ধ বা কার্পাল : রেডিও আলনার নিচে অবস্থিত দুসারিতে মোট আটটি অস্থিকে মনিবন্ধ বা কার্পাল বলে। কার্পাল অস্থিগুলো কবজি গঠন করে।

ঘ. করতল বা মেটাকার্পাল : কার্পাল অস্থির সাথে যুক্ত সরু, লম্বা ও সামান্য বড় ৫টি অস্থিকে করতল বা মেটাকার্পাল বলে। এরা হাতের তালু গঠন করে।

ঙ. অঙ্গুলি বা ফ্লাঞ্জেসঃ বৃদ্ধাঙ্গুলে দুটি ও অপর চারটি অঙ্গুলিতে তিনটি করে মোট চৌদ্দখানা হাড় আছে। এ অস্থিগুলিকে ফ্লাঞ্জেস বলে।

কাজ : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজ আমরা উর্ধ্বাঙ্গ তথা বাহু দিয়ে করে থাকি।

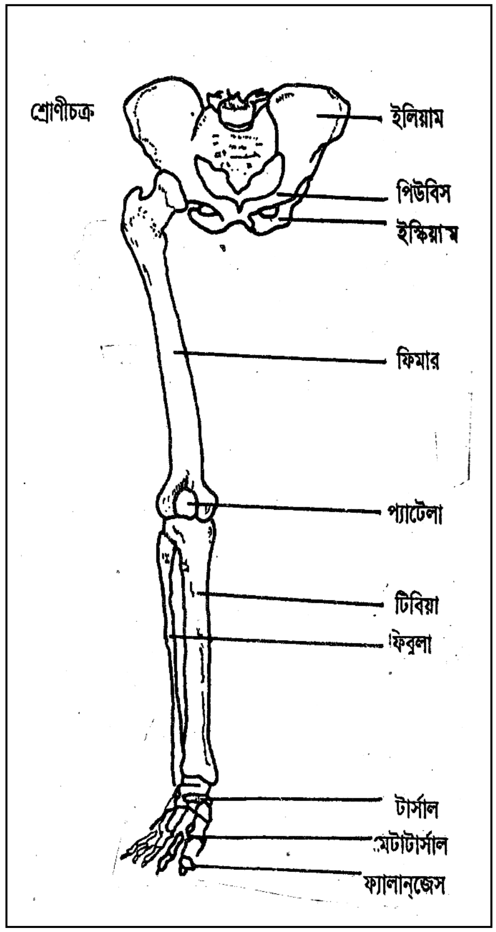

চিত্র ১৮.২-৫ : নিম্নাঙ্গ

নিম্নাঙ্গ

শ্রোণীচক্র ও দু'পায়ের সমন্বয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩১টি করে মোট ৬২টি অস্থি নিম্নাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রোণীচক্র : এটি ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম ও পিউবিস অস্থি নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এ অস্থিগুলো একত্রিত হয়ে নিতম্বঅস্থি (hip bone) গঠন করে। দুটি নিতম্বঅস্থি একত্রিত হয়ে শ্রোণীচক্র গঠিত হয়। দুটি নিতম্বঅস্থির মাঝখানে স্যাক্রাম ও কক্কিক্স অবস্থিত। শ্রোণীচক্রের গর্তে উরু অস্থি বা ফিমার সংযুক্ত থাকে।

পা : প্রতিটি পা নিম্নলিখিত অস্থিগুলো নিয়ে গঠিত। যথা-

ক. উর্ধ্বস্থি বা উরু বা ফিমার : নিতম্ব থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত মানবদেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘ অস্থিটিকে উর্ধ্বস্থি বা ফিমার বলা হয়।

খ. জঙ্ঘাস্থি বা টিবিয়া-ফিবুলাঃ হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত একখানা জঙ্ঘাস্থি (tibia) ও একখানা অনুজঙ্ঘাস্থি (fibula) দ্বারা জঙ্ঘাস্থি গঠিত। জঙ্ঘাস্থি ও ফিমারের সংযোগস্থলের সামনে একখানা ছোট, গোলাকার চ্যাপ্টা অস্থি আছে। একে জানুসন্ধি অস্থি বা প্যাটেলা (patella) বলে।

গ. গুল্ফাস্থি বা টার্সাল : টিবিয়া ফিবুলার নিচের দিকে ৭টি ছোট ছোট অস্থিকে গুল্ফাস্থি বা টার্সাল বলে। এ অস্থিগুলো পায়ের গোড়ালি গঠন করে।

ঘ. মেটাটার্সাল : টার্সাল অস্থির সাথে যুক্ত ৫টি লম্বা অস্থিকে মেটাটার্সাল বলে। এ অস্থিগুলোর সমন্বয়ে পায়ের পাতা বা পদতল গঠিত।

ঙ. ফ্ল্যাঞ্জেস : পায়ের আঙ্গুলের অস্থিগুলোকে ফ্ল্যাঞ্জেস বলে। এদের মোট অস্থি সংখ্যা ১৪।

কাজ

- শ্রোণীচক্র বস্তিকোটর, মূত্রাশয়, অন্ত্রের নিম্নাংশ প্রভৃতি অঙ্গের অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ভার বহন করে ও সুরক্ষক হিসেবে কাজ করে।
- দুটি পা প্রত্যক্ষভাবে শরীরে ভার বহন করে এবং মানুষের চলাচলে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ

- অস্থিবিন্যাস অনুযায়ী অন্তঃকঙ্গালকে মাথার খুলি, মেরুদন্ড, উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ এ কয়টি অংশে ভাগ করা যায়।
- মাথার খুলি ২৯ খানা শক্ত অস্থির সমন্বয়ে গঠিত।
- মেরুদন্ড সর্বমোট ৩৩ খানা অস্থির সমন্বয়ে গঠিত।
- বক্ষ অস্থিচক্র ও দু'বাহু নিয়ে উর্ধ্বাঙ্গ গঠিত হয়।
- শ্রোণীচক্র ও দু'পায়ের সমন্বয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সর্বমোট কতখানা অস্থি নিয়ে মানবদেহ গঠিত?

ক. ১০৬ খানা　খ. ২০৬ খানা　গ. ২০৫ খানা　ঘ. ২০৪ খানা

২. অস্থিবিন্যাস অনুযায়ী অন্তঃকঙ্কাল কয়ভাগে বিভক্ত?

ক. তিন ভাগে　খ. পাঁচ ভাগে　গ. দুই ভাগে　ঘ. চার ভাগে

৩. মেরুদন্ডে সর্বমোট কতখানা অস্থি আছে?

ক. ৩৩ খানা　খ. ৩২ খানা　গ. ৩১ খানা　ঘ. ৩০ খানা

৪. বক্ষ অস্থিচক্র কতজোড়া অস্থি নিয়ে গঠিত?

ক. তিন জোড়া　খ. চার জোড়া　গ. পাঁচ জোড়া　ঘ. দুই জোড়া

৫. শ্রোণীচক্রে কয়টি অস্থি থাকে?

ক. দুইটি　খ. তিনটি　গ. চারটি　ঘ. পাঁচটি।

পাঠ ১৮.৩

পেশীতন্ত্র, পৌষ্টিক তন্ত্র (পৌষ্টিক নালী)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পেশীতন্ত্রের গঠন ও কাজগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- কঙ্কাল ও পেশীতন্ত্রের সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবেন;
- পরিপাকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অঙ্গের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- পৌষ্টিক নালীর কাজ উল্লেখ করতে পারবেন।

পেশীতন্ত্র

একই আকারবিশিষ্ট বা বিভিন্ন আকার ও আয়তনবিশিষ্ট কতকগুলো কোষ একই জায়গা থেকে একইভাগে উৎপন্ন হয়ে যখন নির্দিষ্ট রীতিতে দলবদ্ধভাগে অথবা স্তরে সজ্জিত থেকে কোনো বিশেষ কাজ করে তখন ঐ কোষসমষ্টিকে টিস্যু বলে।

পেশী কোষ থেকে পেশীটিস্যু গঠিত হয়। মানবদেহের মোট ওজনের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ অংশই পেশীটিস্যু।

যে টিস্যু মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয় এবং সংকোচন, প্রসারণ ও সংবেদন ক্ষমতাসম্পন্ন অসংখ্য সূক্ষ তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত তাকে পেশীটিস্যু বলে। বিভিন্ন ধরনের পেশীটিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত হয় পেশীতন্ত্র।

গঠন, অবস্থান ও কাজের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে পেশীটিস্যুকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ঐচ্ছিক পেশী, অনৈচ্ছিক পেশী ও হৃদপেশী।

ঐচ্ছিক পেশী: ইচ্ছা অনুযায়ী যে সমস্ত মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণ করে আমরা অঙ্গ-প্রতঙ্গ চালনা করতে পারি, তাদেরকে ঐচ্ছিক পেশী বলে। যেমন, হাত-পায়ের পেশী। এ সমস্ত পেশীর অধিকাংশই কঙ্কালতন্ত্রের সাথে আটকে থাকে বলে এদেরকে কঙ্কাল পেশীও বলা হয়। এ পেশীগুলোই মাংস নামে অভিহিত।

এ পেশীর কোষগুলো দেখতে নলাকার, ১-৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। কোষগুলিকে সূক্ষ্ম তন্তুর মতো দেখায়। তন্তুগুলো আলাদা বা বিক্ষিপ্ত না থেকে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। প্রতিটি পেশীতন্তু সারকোলেমা নামক একটি সুস্পষ্ট আবরণে আবৃত থাকে। তন্তুগাত্রে কয়েকটি নিউক্লিয়াস থাকে। ইহা সাদা বা কালো রেখা দ্বারা চিহ্নিত। এ সমস্ত মাংসপেশীর মধ্যস্থল মোটা ও প্রান্তভাগ সরু। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হতে যে স্নায়ুগুলি এদের মধ্যে প্রবেশ করে, তাদের তাড়নাতেই এ পেশীগুলি সংকুচিত হয়।

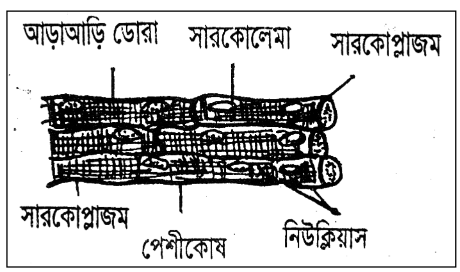

চিত্র ১৮.৩-১ : ঐচ্ছিক পেশী

কাজ : এ পেশীগুলোর সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা খুব দ্রুত এবং শক্তিশালী। হাত ও পা-এর বড় বড় অস্থিসহ দেহের অন্যান্য অংশের সঞ্চালনে এ পেশীগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণির চলন এ পেশীর মাধ্যমে ঘটে।

অনৈচ্ছিক পেশী : যে সকল পেশী স্বেচ্ছায় সংকোচনশীল নয় তাদেরকে অনৈচ্ছিক পেশী বলে। এ সমস্ত পেশীগুলোকে আমরা ইচ্ছানুযায়ী সংকোচন ও প্রসারণ করতে পারি না। যেমন- ধমনী, পাকস্থলী, অন্ত্রগাত্র,

মূত্রাশয় ইত্যাদির মাংসপেশী।

এ পেশীর কোষগুলো মাকু আকৃতির এবং ০.০২ -০.০৫ মি.মি পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। এ কোষের চওড়া অংশের ব্যাস ৮-১০ মাইক্রন। এ পেশীর কোনো আবরণ নেই ও পেশীগাত্রে কোনো দাগ দেখা যায় না। কোষ নিউক্লিয়াস কোষের চওড়া মধ্যস্থলে অবস্থান করে। এরা অস্থির সাথে সংযুক্ত না থেকেও আমাদের অজ্ঞাতসারে জীবনযাত্রার উপযোগী সকল কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এদের কার্যকলাপ স্বতন্ত্রস্নায়ু দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

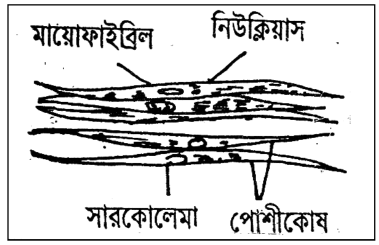

চিত্র ১৮.৩-২ : অনৈচ্ছিক পেশী

কাজ : এ পেশীগুলোর সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী। বিভিন্ন বস্তুর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে এ পেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যেমন- শরীরের খাদ্যবস্তুর চলাচল এ পেশী নিয়ন্ত্রণ করে।

হৃদপেশী : হৃদপিন্ডের পেশীকে হৃদপেশী বলে। এটি এক ধরনের অনৈচ্ছিক পেশী, তবে পেশীতন্তুর গঠন অনৈচ্ছিক পেশী হতে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, পেশীতন্তুগুলো চারকোনা বিশিষ্ট ও এরা সকলেই চিহ্নিত। প্রতিটি টিস্যু অন্যের সাথে অতি সূক্ষ্ম শাখা দ্বারা সংযুক্ত হয়ে জালের মতো গঠনের সৃষ্টি করে। নিউক্লিয়াসটি কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে।

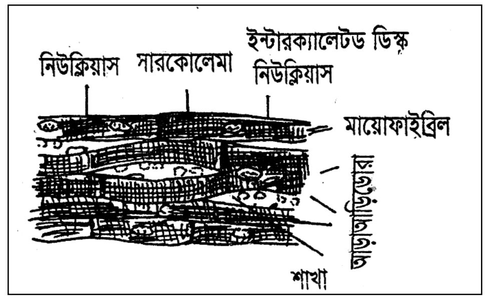

চিত্র ১৮.৩-৩ : হৃদপেশী

কাজ : এ পেশীর সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা দ্রুত । হৃদপিন্ডের সংকোচন প্রসারণ ঘটিয়ে প্রাণিদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করাই হৃদপেশীর কাজ।

কঙ্কাল ও পেশীতন্ত্রের সম্পর্ক

কঙ্কালের সাথে পেশীর উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। মাংসপেশী কঙ্কালতন্ত্রের অস্থির সাথে টেনডন-এর সাহায্যে যুক্ত থাকে। মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে অস্থিগুলো সচল হয়, এর ফলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণিরা চলাচল করতে পারে।

পৌষ্টিক তন্ত্র

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা মানুষ নিজেরা খাদ্য তৈরি করতে পারি না। খাদ্যের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আমরা খাদ্য হিসেবে সরাসরি উদ্ভিদকে গ্রহণ করি, এছাড়া বিভিন্ন প্রাণির মাংসও গ্রহণ করি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমরা যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি তার অধিকাংশই জটিল খাদ্যদ্রব্য। এ সমস্ত জটিল খাদ্যদ্রব্যকে আমাদের শরীর সরাসরি শোষণ করতে পারে না। শরীরকে শোষণক্ষম করতে জটিল খাদ্যদ্রব্য ভেঙ্গে দ্রবণীয়, সরল ও তরল অবস্থায় রূপান্তর প্রয়োজন।

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জটিল, অদ্রবণীয় জৈব খাদ্যবস্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় দেহের গ্রহণ উপযোগী দ্রবণীয়, সরল ও তরল খাদ্য উপাদনে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে।

খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্য নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় গ-ুকোজে পরিণত হয়। একইভাবে আমিষ জাতীয় খাদ্য অ্যামাইনো এসিডে এবং ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাদ্য ফ্যাটি এসিড ও গি- সারলে পরিণত হয়।

যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাক প্রক্রিয়া ও শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে পৌষ্টিক তন্ত্র বলে। মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্র প্রধানত : দুটি অংশে বিভক্ত। যথা- পৌষ্টিক নালী ও পৌষ্টিক গ্রন্থি

পৌষ্টিক নালী : মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত নালীকে পৌষ্টিক নালী বলা হয়। পরিপাক নালী ঠোঁট থেকে শুরু

করে গলা, বক্ষ, উদর হয়ে পায়ুতে শেষ হয়। পৌষ্টিক নালী প্রায় ৮-১০ মিটার লম্বা একটি প্যাঁচানো নালী এবং এর অংশগুলো নিম্নরূপ :

ক. মুখছিদ্র : মুখমন্ডলে নাকের নিচে অবস্থিত অনুপ্রস্থ ছিদ্রটিকে মুখছিদ্র বলে। এ ছিদ্র থেকে পৌষ্টিক নালী শুরু। এ ছিদ্র উপর ও নিচে দুটো ঠোঁট দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

কাজ : মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য পৌষ্টিক নালীতে প্রবেশ করে। উপরের ও নিচের ঠোঁট খাদ্য ধরে রাখা এবং মুখছিদ্র খোলা ও বন্ধ রাখায় অংশগ্রহণ করে।

খ. মুখ-গহ্বর : মুখছিদ্রের ঠিক পিছনে অবস্থিত গহ্বরটিকে মুখ-গহ্বর বলে। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্য এ গহ্বরে প্রবেশ করে। মুখ-গহ্বরের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের দাঁতসহ, একটি জিহ্বা এবং তিনজোড়া লালাগ্রন্থি থাকে। লালা গ্রন্থিগুলি পৃথক পৃথক নালীর মাধ্যমে মুখ-গহ্ববের সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ :

দাঁত খাদ্যদ্রব্য ছেঁড়া, কাটা, ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করা এবং পেষণ করায় অংশ নেয়।

জিহ্বা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্য দ্রব্যকে গিলতে সাহায্য করে।

লালাগ্রন্থিসমূহ কর্তৃক নি:সৃত লালারসের মিউসিন খাদ্যকে ভিজিয়ে নরম এবং পিচ্ছিল করে খাদ্য গলাধঃকরণে অংশ নেয়।

গ. গলবিল : মুখগহ্বর এবং অন্ননালীর মধ্যবর্তী ছোট অংশকে গলবিল বলে। মুখগহ্ববেরর পিছনের প্রান্তে অবস্থিত গ্যালেট নামক ছিদ্রের মাধ্যমে মুখগহ্বর গলবিলে যুক্ত হয়।

কাজ : গলবিলের মাধ্যমে লালা মিশ্রিত আংশিক পরিপাককৃত খাদ্যদ্রব্য মুখ গহ্বর থেকে অন্ননালীতে পৌঁছায়।

ঘ. অন্ননালী : গলবিলের পিছনে অবস্থিত নালীকে গলনালী বা অন্ননালী বলে। এ নালী প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা।

কাজঃ অন্ননালীর মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য গলবিল থেকে পাকস্থলীর গহ্বরে প্রবেশ করে।

ঙ. পাকস্থলী : অন্ননালীর পিছনে অবস্থিত বৃহদাকার থলির মত অংশকে পাকস্থলী বলে। পাকস্থলীর প্রাচীর অত্যন্ত পুরু ও পেশীবহুল। পাকস্থলীর সম্মুখভাগ অন্ননালীর সাথে এবং পশ্চাতভাগ ডিওডেনামের সাথে যুক্ত। পাকস্থলীর প্রাচীরে গ্যাষ্টিক গ্রন্থি নামক অনেক গ্রন্থি আছে। গ্যাষ্টিক গ্রন্থি থেকে পাচক রস বা গ্যাষ্টিক রস নিঃসৃত হয়।

কাজ :

১. পাকস্থলীতে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে এবং অম্লীয় মাধ্যমে আমিষ জাতীয় খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়।

২. গ্যাস্টিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পাচক রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

চ. ক্ষুদ্রান্ত : পাকস্থলীর পর থেকে বৃহদান্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত অপেক্ষাকৃত লম্বা, প্যাঁচানো নালীটিকে ক্ষুদ্রান্ত বলে।

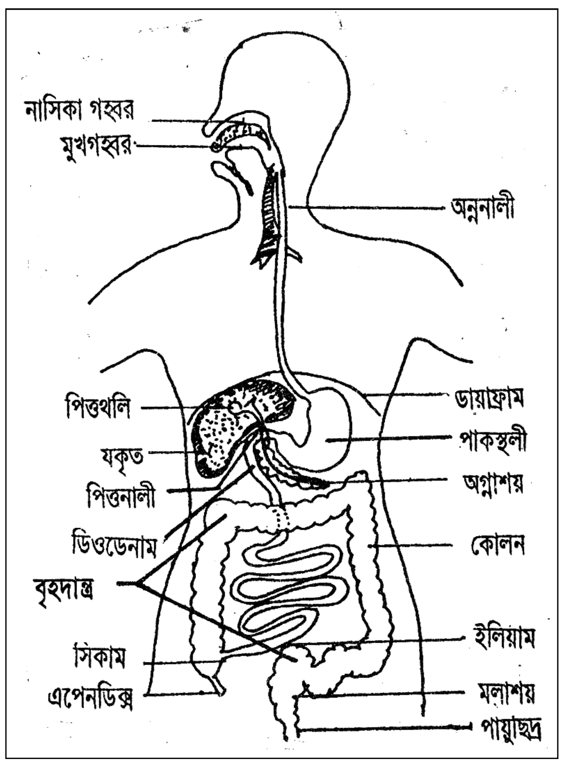

চিত্র ১৮.৩-৪ : পরিপাকতন্ত্র

ক্ষুদ্রান্ত আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা-ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম

ক্ষুদ্রান্ত প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা। ক্ষুদ্রান্তের ডিওডেনাম অংশে পিত্ত অগ্নাশয় নালী যুক্ত। যকৃতের পিত্তরস এবং অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত অগ্নাশয় রস-পিত্ত অগ্নাশয় নালীর মাধ্যমে ডিওডেনামে আসে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের অন্তঃপ্রাচীরে অসংখ্য আঙ্গুলের ন্যায় প্রবৃদ্ধি বা ভিলাস (বহুবচনে-ভিলাই) থাকে।

কাজ :

১. পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে ক্ষারীয় মাধ্যমের সৃষ্টি করে, যা খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

২. পরিপাককৃত খাদ্যসার ইলিয়ামের ভিলাইসমূহে শোষিত হয়।

ছ. বৃহদান্ত্র : ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী মোটা নলাকৃতি অংশকে বৃহদান্ত্র বলে। বৃহদান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত যথা- সিকাম, কোলন ও মলাশয়। সিকামের সাথে এক মুখ বন্ধ ছোট নলাকৃতি প্রবৃদ্ধি যুক্ত থাকে। একে এ্যাপেনডিক্স বলে।

কাজ :

১. মলাশয় বর্জ্য পদার্থ মলরূপে জমা রাখে।

২. আপাচ্য খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় পানি এবং লবণ পুনঃশোষণ করে।

জ. পায়ু : পৌষ্টিক নালীর শেষ অংশে অবস্থিত ছিদ্র পথকে পায়ু বলে।

কাজ **:** মল পায়ুপথে দেহের বাহিরে নির্গত হয়।

সারসংক্ষেপ

- যে টিস্যু মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয় এবং সংকোচন, প্রসারণ ও সংবেদন ক্ষমতাসম্পন্ন অসংখ্য সূক্ষ্মতন্তুর সমন্বয়ে গঠিত তাকে পেশীটিস্যু বলে। বিভিন্ন ধরনের পেশীটিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত হয় পেশীতন্ত্র।
- গঠন, অবস্থান ও কাজের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে পেশী টিস্যুকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ঐচ্ছিক পেশী, অনৈচ্ছিক পেশী এবং হৃদপেশী।
- যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাক প্রক্রিয়া ও শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। পৌষ্টিকতন্ত্র প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত, যথা- পৌষ্টিক নালী ও পৌষ্টিক গ্রন্থি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পেশীকে কতভাগে ভাগ করা হয়?

ক. দুই   খ. তিন   গ. চার   ঘ. পাঁচ

২. পৌষ্টিক নালীর দৈর্ঘ্য কত মিটার?

ক. ৮-১০ মিটার   খ. ৬-৮ মিটার   গ. ৭-৯ মিটার   ঘ. ৫-৭ মিটার

৩. পাচক রস কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়?

ক. গলবিল   খ. মুখ গহ্বর   গ. অন্ননালী   ঘ. গ্যাষ্টিক গ্রন্থি

৪. ক্ষুদ্রান্ত্র কয়টি অংশে বিভক্ত?

ক. দুইটি খ. চারটি গ. তিনটি ঘ. পাঁচটি।

পাঠ ১৮.৪

পৌষ্টিক তন্ত্র : গ্রন্থি, পরিপাক প্রক্রিয়া ও সাধারণ রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিপাক গ্রন্থিগুলোর গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিপাক গ্রন্থিগুলোর কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাধারণ রোগগুলো সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- রোগগুলোর প্রতিকার ব্যবস্থা বলতে পারবেন।

পরিপাক গ্রন্থি

যে সকল গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদেরকে পরিপাক গ্রন্থি বলে। মানবদেহের পরিপাক গ্রন্থিসমূহ নিম্নরূপ-

লালাগ্রন্থি : মানুষের মুখ গহ্বরে তিনজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। এগুলো হল- প্যারোটিড গ্রন্থি, সাব ম্যান্ডিবুলার এবং সাব লিঙ্গুয়াল। এসব লালা গ্রন্থিসমূহ পৃথক পৃথক নালীর মাধ্যমে মুখ গহ্বরে উন্মুক্ত হয়।

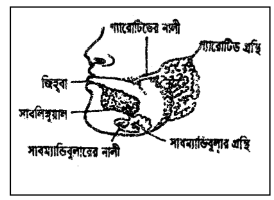

চিত্র ১৮.৪.-১ : লালাগ্রন্থি

লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের নাম লালারস। লালারসে পানি এবং টায়ালিন নামক এনজাইম থাকে।

কাজ :

১. গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা খাদ্যকে সিক্ত করে এবং নরম করে।

২. চর্বনের সুবিধা সৃষ্টি করে।

৩. টায়ালিন জাতীয় এনজাইম স্টার্চকে ভেঙ্গে সরল শর্করা (মলটোজ)-য় পরিণত করে।

যকৃত : যকৃত মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। এটি মধ্যচ্ছদার নিচে পাকস্থলীর ডান পাশে অবস্থিত গাঢ় বাদামী বর্ণের ত্রিকোণাকার অঙ্গ। যকৃতের সাথে কলস আকৃতির পিত্তথলি সংযুক্ত থাকে। যকৃত থেকে নিঃসৃত পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা থাকে। সাধারণত পিত্তনালীর মাধ্যমে পিত্তরস যকৃত থেকে ডিওডেনামে আসে।

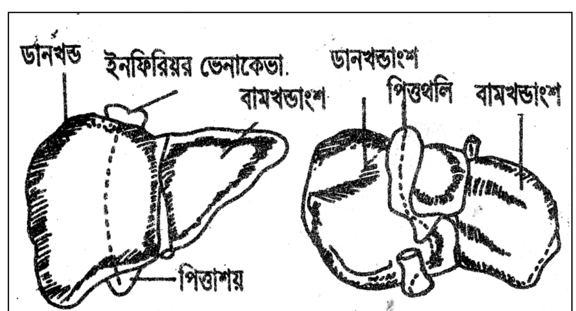

চিত্র ১৮.৪.-২ : যকৃত (অক্ষীয় দেশ ও পৃষ্ঠ দেশ)

কাজ :

১. ক্ষারীয় পিত্তরস নিঃসৃত করে পিত্তথলিতে জমা রাখে।

২. অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত রাখে।

৩. রক্তে গ্লুকোজের ঘাটতি হলে গ্লুকোজ সরবরাহ করে। এভাবে যকৃত রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

অগ্নাশয় : পাকস্থলীর পিছনে এবং ডিওডেনামের দু'বাহুর মধ্যে প্রায় আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশ্র গ্রন্থি। অগ্নাশয় নালী হতে কয়েকটি নালী একত্রিত হয়ে অগ্নাশয় নালী গঠন করে। অগ্নাশয় নালী পিত্তনালীর

সাথে মিলিত হয়ে যকৃত অগ্নাশয় নালী গঠন করে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়। অগ্নাশয় প্রকৃতপক্ষে একটি মিশ্রগ্রন্থি। কারণ এতে নালীযুক্ত ও নালীবিহীন উভয় প্রকার গ্রন্থি থাকে। নালীযুক্ত গ্রন্থির নিঃসৃত রসকে অগ্নাশয় রস বলে। নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন ও গ্লুকাগণ হরমোন তৈরি হয়।

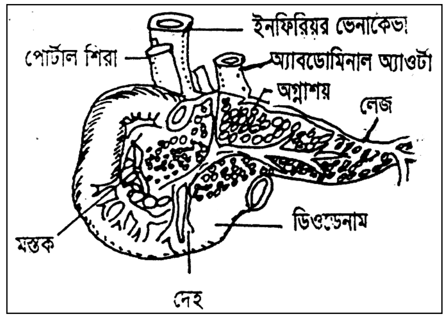

চিত্র ১৮.৪.-৩ : অগ্নাশয়

কাজ :

১. অগ্নাশয় রস খাদ্য পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. ইনসুলিন ও গ্লুকাগণ রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

গ্যাষ্টিক গ্রন্থি : পাকস্থলীর প্রাচীরে অবস্থিত গ্রন্থিসমূহকে গ্যাষ্টিক গ্রন্থি বলে। গ্যাষ্টিক গ্রন্থি গ্যাষ্টিক রস নিঃসৃত করে।
কাজঃ খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

আন্ত্রিক গ্রন্থি : ডিওডেনাম ও অন্ত্রে অবস্থিত গ্রন্থিসমূহকে আন্ত্রিক গ্রন্থি বলে।
কাজ : আন্ত্রিক গ্রন্থি আন্ত্রিক রস নিঃসৃত করে।

পরিপাক প্রক্রিয়া

আমরা সাধারণত কঠিন বা তরল আকারে জটিল খাদ্য গ্রহণ করি। এ জটিল খাদ্য পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশে (যেমন- মুখবিবর, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতি) বিভিন্ন এনজাইমের প্রভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে সরল খাদ্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ খাদ্য হজম হয়। নিচে পরিপাক প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো-

মুখবিবরে পরিপাক : মুখ গহ্বরে খাদ্য জিহ্বা ও দাঁতের সাহায্যে চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট চোট টুকরায় পরিণত হয়। একইসাথে লালাগ্রন্থি হতে নিঃসৃত লালা খাদ্যের সাথে মিশিত হয়। লালা খাদ্য গলাধঃকরণে সহায়তা করে। লালাতে টায়ালিন বা স্যালিভারি অ্যামাইলেজ নামক এনজাইম থাকে। স্যালিভারি অ্যামাইলেজ খাদ্যের শর্করা অংশকে ভেঙ্গে মলটোজে পরিণত করে।

মুখ থেকে খাদ্যদ্রব্য অন্ননালীর মধ্যদিয়ে পাকস্থলীতে আসে পেরিস্টালসিস প্রক্রিয়ায়। পৌষ্টিক নালীর গাত্রের মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণে খাদ্যের সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে পেরিস্টালসিস বলে।

পাকস্থলীতে পরিপাক : পাকস্থলীতে খাদ্য পৌঁছাবার পর প্রাচীরের গাত্রে অবস্থিত গ্যাষ্টিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্যাষ্টিক রস খাদ্যের উপর ক্রিয়া শুরু করে। গ্যাষ্টিক রসে তিনটি উপাদান বিদ্যমান। যথা-

ক. **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড :** হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যে উপস্থিত জীবাণু ধ্বংস করে এবং এনজাইম পেপসিনের কাজের উপযোগী অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

খ. **পেপসিন :** পেপসিন একটি এনজাইম। এটি আমিষ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

গ. **রেনিন :** এটি একটি এনজাইম। এটি দুধের ক্যাজিনকে প্যারাক্যাজিনে পরিণত করে। পাকস্থলীর সংকোচন-প্রসারণে গ্যাষ্টিক রস খাদ্যের সাথে ভালোভাবে মিশতে পারে এবং এ রসের ক্রিয়ার পর খাদ্যদ্রব্য নরম ও তরল অবস্থায় পরিণত হয়, এ অবস্থাকে কাইম বলে। এরপর কাইম অল্প অল্প করে নালীপথে পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে প্রবেশ করতে থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ তথা ডিওডেনামে খাদ্যবস্তু পৌঁছাবার সাথে সাথে পিত্তথলিতে জমাকৃত পিত্তরস পিত্তনালী পথে এবং অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত অগ্নাশয় রস এসে খাদ্যবস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়। একই সঙ্গে আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত আন্ত্রিক রসও এসে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়।

পিত্তরস ক্ষারধর্মী। এ রস খাদ্যবস্তুর অম্লীয় অবস্থাকে প্রশমিত করে ক্ষারীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। এছাড়া এ রস চর্বি জাতীয় খাদ্যবস্তুকে ভাঙতে সহায়তা করে।

অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত অগ্নাশয় রসে তিন ধরনের এনজাইম থাকে, যথা- ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ। ট্রিপসিন, পলিপেপটাইডকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে; লাইপেজ, চর্বিকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে এবং

অ্যামাইলেজ, মলটোজকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত আন্ত্রিক রসে মলটেজ, সুক্রেজ, ল্যাকটেজ প্রভৃতি এনজাইম থাকে। মলটেজ এনজাইম মলটোজকে, সুক্রেজ এনজামাইম সুক্রোজকে এবং ল্যাকটেজ এনজাইম ল্যাকটোজকে ভেঙ্গে গ-ুকোজে পরিণত করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে অনেকগুলো আঙ্গুলের ন্যায় অভিক্ষেপ আছে, এদেরকে ভিলাস বলে। ভিলাস হজমকৃত খাদ্যসার উপাদান শোষণ করে। ভিলাসের রক্তনালী গ-ুকোজ ও অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং লসিকা নালী ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল শোষণ করে। খাদ্যসারবস্তু শোষণের পর অপরিপাককৃত ও অশোষিত অবশিষ্টাংশ বৃহদান্ত্রে প্রবেশ করে।

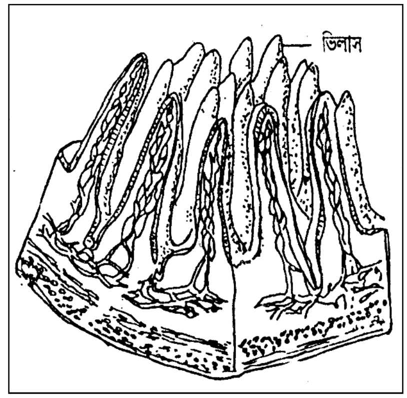

চিত্র ১৮.৪-৪ : (ক) ইলিয়ামের গঠন

বৃহদান্ত্রে আত্মীকরণ : এখানে খাদ্যবস্তুর কোনো পরিপাকক্রিয়া ঘটে না। তবে অবশিষ্ট খাদ্যোপাদানের সাথে অবস্থিত পানি এখানে শোষিত হয়। এরপর অবশিষ্ট অংশ মল হিসেবে মলাশয়ে জমা হয়। পরিশেষে মল পায়ুপথে বাইরে বেরিয়ে আসে।

কতিপয় সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

আমাশয় : আমাশয় আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগ। এমন লোক পাওয়া যাবে না যিনি কখনও আমাশয় আক্রান্ত হননি। আমাশয় দু'ধরনের, যথা- ব্যাসিলারি আমাশয় ও অ্যামিবিক আমাশয়।

ক. ব্যাসিলারি আমাশয় : *Shigella* spp. নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অন্ত্র আক্রান্ত হলে, এ ধরনের আমাশয় দেখা দেয়। ব্যাকটেরিয়া বৃহাদন্ত্রের ঝিল্লীকে আক্রমণ করে। ফলে বার বার পায়খানা হয় এবং মলের সাথে শ্লেষা যুক্ত থাকে। এ রোগ মারাত্মক হলে মলের সঙ্গে রক্তও বের হয়। মলের সঙ্গে রক্ত বের হলে তখন আমাশয়কে রক্ত আমাশয় বলে। এ রোগ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

খ. অ্যামিবিক আমাশয় : অ্যামিবা নামক এককোষী পরজীবী আমাশয় সৃষ্টির কারণ হলে, তাকে অ্যামিবিক আমাশয় বলা হয়। সাধারণত এন্টামিবা এ রোগ ঘটায়। এন্টামিবা সরল এককোষী প্রাণি। এটি পরজীবী হিসেবে মানুষের অন্ত্রে বাস করে এবং আমাশয় সৃষ্টি করে। এন্টামিবা দ্বারা আক্রান্ত মানুষের মলের সাথে এ জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে পানি শাকসবজি জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে সুস্থ লোকের অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে।

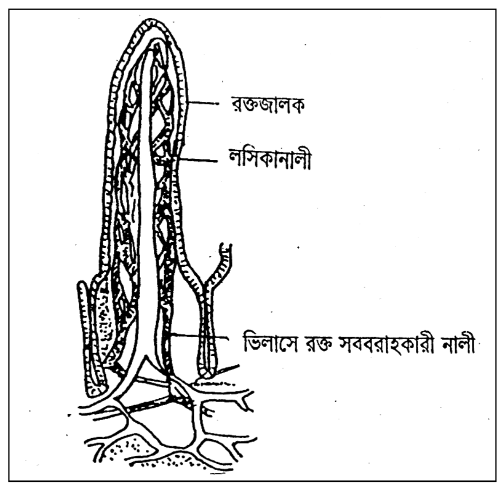

চিত্র ১৮.৪-৪ : (খ) ভিলাসের গঠন

প্রতিকার : ব্যাসিলারি আমাশয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক যেমন- সালফাগুয়ানিডিন, নিওমাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অ্যামিবিক আমাশয়ের ক্ষেত্রে মেট্রোনিডাজল ব্যবহার করা হয়। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ওষুধ সেবন বাঞ্চনীয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য : প্রকৃত পক্ষে কোষ্ঠ কাঠিন্য কোনো রোগ নয়। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠ কাঠিন্য হতে পারে-

- সময়মত মলত্যাগ না করলে।
- পানি কম পরিমাণে পান করলে।
- শাকসবজি জাতীয় খাদ্য কম খেলে।
- পরিমিত ব্যায়াম না করলে।

এ সমস্ত কাজগুলো ঠিকমতো করলে কোষ্ঠ কাঠিন্য থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

গ্যাস্ট্রাইটিস : এটি একটি পাকস্থলী ঘটিত রোগ। খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড নিঃসৃত হয়, যা খাদ্য উপাদানের সাথে মিশে অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। এ অম্লীয় অবস্থা পাকস্থলীতে জীবাণু ধ্বংস ও খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দীর্ঘদিন খাদ্যগ্রহণে অনিয়ম করলে তথা সময় মত খাদ্য গ্রহণ না করলে পাকস্থলীতে অম্লের আধিক্য দেখা দেয়। ফলে গলা, পেট জ্বালা করা, পেট ব্যথা করা সহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। এ সমস্ত উপসর্গ দেখা দিলে তাকে গ্যাসট্রাইটিস রোগ বলে। এ রোগ হবার পর যথাযথভাবে চিকিৎসা না করলে পাকস্থলী ও অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি করে। পাকস্থলী বা অন্ত্রে এ ভাবে সৃষ্ট ক্ষতকে গ্যাষ্ট্রিক আলসার বলে।

প্রতিকার : এ রোগ হলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরী। এর পাশাপাশি নিয়মিতভাবে এবং ঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ করে এ রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

- যে সকল গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদেরকে পরিপাক গ্রন্থি বলে।
- মানবদেহের গ্রন্থিগুলো হলো- লালা গ্রন্থি, যকৃত, অগ্নাশয়, গ্যাষ্টিক গ্রন্থি, আন্ত্রিক গ্রন্থি প্রভৃতি।
- খাদ্য পরিপাক মুখ গহ্বর থেকে শুরু হয় এবং ক্ষুদ্রান্তে যেয়ে শেষ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থির নাম কি?
ক. যকৃত খ. অগ্নাশয় গ. লালাগ্রন্থি ঘ. গ্যাষ্টিক গ্রন্থি

২. টায়ালিন কোনো গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়?
ক. যকৃত খ. অগ্নাশয় গ. লালাগ্রন্থি ঘ. গ্যাষ্টিক গ্রন্থি

৩. ইনসুলিন কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়?
ক. গ্যাষ্টিক গ্রন্থি খ. লালা গ্রন্থি গ. যকৃত ঘ. অগ্নাশয়

৪. গ্যাষ্টিক গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত?
ক. ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে খ. পাকস্থলী প্রাচীরে গ. বৃহদান্ত্র প্রাচীরে ঘ. মুখ গহ্বরে

৫. অ্যামাইলেজ নিচের কোনটিকে ভেঙ্গে গ-ুকোজ তৈরি করে?
ক. চর্বি খ. ল্যাকটোজ গ. মলটোজ ঘ. সুক্রোজ

৬. *Shigella spp.* দিয়ে কোন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়?
ক. আমাশয় খ. কলেরা গ. যক্ষা ঘ. মাথাব্যথা।

পাঠ ১৮.৫

রক্ত ও রক্ত সংবহনতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রক্ত কি তা বলতে পারবেন;
- রক্তের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- রক্তের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- রক্তের শ্রেণী বিভাগ করতে পারবেন;
- রক্তচাপ কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রক্ত

রক্ত মানবদেহের বদ্ধ রক্তনালীসমূহের ভিতর দিয়ে সতত প্রবাহমান বিশেষ ধরনের সজীব তরল যোজক টিস্যু। রক্তের বর্ণ লাল। এতে অসংখ্য রক্তকণিকা ভাসমান থাকে বলেই ইহা লাল বর্ণের দেখায়। পূর্ণবয়স্ক একজন লোকের শরীরে রক্তের পরিমাণ প্রায় ৫-৬ লিটার। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা তরল থাকে, তবে শরীর হতে বাহির হলে ইহা ২-৫ মিনিটের মধ্যে জমাট বেধে যায়। এর স্বাদ লবণাক্ত এবং প্রতিক্রিয়া সামান্য ক্ষারযুক্ত। জীবদেহে এর উত্তাপ ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রক্তের উপাদান

প্রধানত রক্তে দু'প্রকার উপাদান থাকে, যথা-রক্তরস ও রক্তকণিকা।

রক্তরস : রক্তের তরল বর্ণহীন অংশকে রক্তরস বলে। রক্তরসে রক্তকণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে। সাধারণত রক্তের শতকরা ৫৫ ভাগ রক্তরস। এতে আমিষ, লবণ ও অন্ত্র হতে শোধিত খাদ্য উপাদানসমূহ উপস্থিত থাকে। এছাড়াও রক্তরসে ৯০-৯২% পানি, গ্লুকোজ, আমাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, খনিজলবণ, হরমোন, ভিটামিন, ইউরিয়া, এন্টিবডি, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বর্জ্য থাকে। আমরা যা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তা পরিবর্তিত হয়ে অন্ত্রগাত্র দ্বারা শোষিত হয় ও রক্তরসে মিশ্রিত হয়ে দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। রক্তরসের মাধ্যমে দেহের দূষিত পদার্থ নির্গত হয়।

রক্তকণিকা : মানবদেহে তিন প্রকার রক্তকণিকা পাওয়া যায়। যথা- ১. লোহিত রক্তকণিকা, ২. শ্বেত রক্তকণিকা, ৩. অণুচক্রিকা

১. লোহিত রক্তকণিকা : পরিণত লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার, উভয় অবতল, নিউক্লিয়াবিহীন ও চাকতীর মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে দেখা যায় না। এদের মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক এক প্রকার পদার্থ আছে বলে রক্ত লাল দেখায়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে এদের সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় পঞ্চাশ লাখ। স্তন্যপায়ী জীবের লোহিতকণিকার মধ্যে কোনো কোষকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস না থাকলেও এদেরকে জীবকোষ বলা হয়।

লোহিত কণিকা প্রধানত লাল অস্থি-মজ্জা, প্লীহা প্রভৃতির মধ্যে উৎপন্ন হয়। লোহিত কণিকার আয়ু ও কার্যকাল সাধারণত ১২০ দিন। লোহিত কণিকার প্রধান কাজ হিমোগ্লোবিনের সাহায্যেই হয়ে থাকে। তারা ফুসফুস হতে অক্সিজেন বহন করে দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে এবং সেখান থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করে এনে ফুসফুসের মাধ্যমে বের করে দেয়।

শ্বেত রক্তকণিকা : শ্বেত কণিকা আকারে লোহিত কণিকা হতে বড় ও নিউক্লিয়াস যুক্ত। এরা বর্ণহীন, এজন্য এদেরকে শ্বেতকণিকা বলা হয়। এদের সংখ্যা লোহিত কণিকা অপেক্ষা কম। প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে এদের

সংখ্যা প্রায় ৫০০০-১১০০০। প্রয়োজন হলে এদের আকার পরিবর্তন হতে পারে এবং এরা শরীরের একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাফেরা করতে পারে। নিউক্লিয়াসের গঠন ও রঞ্জক ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে শ্বেতকণিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- নিউট্রোফিল, ইউসিনোফিল ও বেসোফিল। এরা সকলে দানাদার শ্বেতকণিকা। আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে অদানাদার শ্বেতকণিকা দ'প্রকার, যথা- লিমেকাসাইট ও মনোসাইট।

শ্বেতকণিকা সমূহ দেহের প্রহরীস্বরূপ কাজ করে। মানবদেহ কোনো রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে তাকে ধ্বংস করাই এর প্রধান কাজ। এ আক্রমণের সময়ে কণিকাগুলি নিজ দেহের কিছু অংশ রোগ জীবাণুর দিকে প্রসারিত করে দেয় এবং তাকে গ্রাস করে নিজের শরীরের মধ্যে টেনে আনে ও ধ্বংস করে। এজন্য শ্বেত রক্ত কণিকাকে ফ্যাগোসাইট (Phagocyte) বলে। আর জীবাণু ধ্বংস করার এ প্রক্রিয়াকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে।

অণুচক্রিকা : অণুচক্রিকা সবচেয়ে ক্ষুদ্র রক্তকণিকা। এরা বর্ণহীন, দেখতে চতুষ্কোণ চাকতির ন্যায় ও রক্তে গুচ্ছাকারে দানার মত থাকে। সংখ্যায় এরা অনেক কম, সাধারণত এক কিউবিক মিলিমিটারে ২,৫০,০০০ থাকে। এদের কোষে কোনো নিউক্লিয়াস নেই। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র ৩-১০ দিন। লাল অস্থিমজ্জা থেকে অণুচক্রিকা সৃষ্টি হয়। এরা রক্তকে জমাট বাধতে সহায়তা করে, ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

চিত্র ১৮.৫-১ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে; যথা-

- আমরা যে খাদ্য খাই, পরিপাকের পর তার সারাংশ রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়। রক্ত সেই খাদ্যসারকে দেহের সকল অংশে নিয়ে যায়। এভাবে জীবকোষগুলো পুষ্টি সাধন করে।
- রক্তের লোহিত কণিকাস্থ হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে ফুসফুস হতে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছায় এবং কোষগুলো হতে কার্বন-ডাই অক্সাইড বহন করে এনে ফুসফুসের মাধ্যমে বাইরে বের করে দেয়।
- দেহের মধ্যে সর্বদাই দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে। তাতে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে বিভিন্ন তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং এভাবে দেহে তাপের সমতা রক্ষা পায়।
- নালীবিহীন গ্রন্থিগুলিতে অন্তঃনিসৃত রস সরাসরি রক্তে মেশে। এ রসকে হরমোন বলে। সঞ্চালিত রক্তের দ্বারা হরমোন প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ হয়।
- রক্তের শ্বেতকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোনো অবৈধ প্রবেশকৃত ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে।
- দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাধতে সহায়তা করে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।
- রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রকার দূষিত পদার্থ ও বর্জ্য উপাদান বহন করে ফুসফুস, মূত্রাশয় ও ত্বকে নিয়ে আসে ও সেখান হতে তাদের নিষ্কাশন করতে সহায়তা করে।

রক্তের শ্রেণীবিভাগ

কোনো মানুষ তার নিজের রক্তের একই শ্রেণীভুক্ত বা অন্যকোনো গ্রহণযোগ্য শ্রেণীর রক্ত অপর কোনো মানুষের শরীর (রক্তদাতা) হতে গ্রহণ করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দাতা গ্রহিতার রক্তের না মিল হওয়াই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রহিতা মারা যায়। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিতা-মাতার রক্তের কারণে সন্তানের শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সকল মানুষের রক্ত একই রকম নয় বলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার প্লাজমামেমব্রেনের বাইরের দিকে দু'ধরনের অ্যাগ্লুটিনোজেন (agglutinogen) পাওয়া যায়। এদেরকে অ্যাগ্লুটিনোজেন A বা এন্টিজেন A এবং অ্যাগ্লুটিনোজেন B বা এন্টিজেন B বলে। একইসাথে রক্তরসে দু'ধরনের অ্যাগ্লুটিনিন (agglutinin) পাওয়া যায়। এদেরকে অ্যাগ্লুটিনিন a বা এন্টিবডি a এবং অ্যাগ্লুটিনিন b বা এন্টিবডি b বলে। প্রতিটি এন্টিবডি শুধু নির্দিষ্ট এন্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম।

অর্থাৎ এন্টিবডি a শুধু এন্টিজেন A-এর সাথে এবং এন্টিবড়ি b শুধু এন্টিজেন B-এর সাথে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। রক্তে এ এন্টিজেন ও এন্টিবডির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এ ধরনের শ্রেণীবিণ্যাসকে ABO রক্ত গ্রুপ বলে।

মানুষের (ABO) রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য

রক্ত গ্রুপ	এন্টিজেন	এন্টিবডি	যে গ্রুপকে রক্তদান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	A	b	A ও AB	A ও O
B	B	a	B ও AB	B ও O
AB	A ও B	কোনো এন্টিবডি নেই	AB	AB, A, B, O (সর্বগ্রুপ)
O	কোনো এন্টিজেন নেই	a ও b	A, B, AB, O (সর্বগ্রুপ)	O

সাধারণ রোগ

রক্তচাপ : হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদপিন্ড থেকে ধমনীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনী প্রাচীরে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে।

হৃদপিন্ডের সংকোচনকে সিস্টোল এবং প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। সিস্টোল অবস্থায় ধমণীতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টেলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ থাকে তাকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটার।

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিকভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তচাপ থাকে। যেমন- একজন পূর্ণবয়স্ক স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের সিস্টোলিক চাপ ১০০-১৪০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৬৫-৯০। নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিক যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে কম বা বেশি হলে তা রোগের নির্দেশ করে। রক্তচাপ বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ এবং কম হলে তাকে নিু রক্তচাপ বলে। সিস্টোলিক চাপ ১৪০ এর বেশি এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৯০-এর বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশান (hypertension) বলে।

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আধুনিক বিশ্বের একটি মারাত্মক রোগ। উচ্চ রক্তচাপ হলে মস্তিষ্কের সরু সরু শিরা বা ধমনী ছিড়ে যেতে পারে। একে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বলে। এর ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ

রক্তচাপের ন্যায় ততটা মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে গেলে শরীরে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপ

- রক্ত মানবদেহের বদ্ধ রক্তনালীসমূহের ভিতর দিয়ে সতত প্রবাহমান বিশেষ ধরনের সজীব তরল যোজক টিস্যু। রক্তের বর্ণ লাল।
- রক্ত দু'ধরনের উপাদান দ্বারা গঠিত; যথা- রক্তরস ও রক্তকণিকা।
- মানবদেহে তিন ধরনের রক্তকণিকা পাওয়া যায়; যথা- লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা।
- রক্তের গ্রুপ চারটি; যথা- A, B, AB ও O।
- হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদপিন্ড থেকে ধমনীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমণী প্রাচীরে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পূর্ণ বয়স্ক লোকের শরীরে কি পরিমাণ রক্ত থাকে?

ক. ৩-৪ লিটার   খ. ৪-৫ লিটার   গ. ৫-৬ লিটার   ঘ. ৬-৭ লিটার

২. জীবদেহে বিদ্যমান রক্তের তাপমাত্রা কত?

ক. ৯০° ফারেনহাইট   খ. ১০০° ফারেনহাইট   গ. ১১০°ফারেনহাইট   ঘ. ১২০° ফারেনহাইট

৩. লোহিত রক্ত কণিকার আয়ুষ্কাল কত দিন?

ক. ১২০ দিন   খ. ১১০ দিন   গ. ১০০ দিন   ঘ. ৯০ দিন

৪. নিচের কোনটি কোষের ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে?

ক. লোহিত রক্ত কণিকা   খ. অণুচক্রিকা   গ. লাইসোসোম   ঘ. শ্বেত রক্ত কণিকা

৫. নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে কি নিঃসৃত হয়?

ক. HCl   খ. পিত্তরস   গ. হরমোন   ঘ. অগ্নাশয় রস।

পাঠ ১৮.৬

হৃদপিন্ড ও রক্ত সঞ্চালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হৃদপিন্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- হৃদপিন্ডের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- রক্তচাপ নির্ণয় পদ্ধতি নিরূপণ করতে পারবেন।

হৃদপিন্ড

ইহা বক্ষ গহ্বরের বামদিকে দুই ফুসফুসের মধ্যভাগে অবস্থিত ও দেখতে ত্রিকোণাকার। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির হৃদপিন্ড দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি ও প্রস্থ সাড়ে তিন ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ৩০০ মিলিগ্রাম। হৃদপিন্ড এক প্রকার বিশেষ ও স্বাধীন অনৈচ্ছিক মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। ইহা তিন স্তর বিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা আবৃত; যথা- বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম, মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম ও অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম। এপিকার্ডিয়াম বা বহিঃস্তর একটা পর্দা বিশেষ, এটা হৃদপিন্ডকে আবৃত করে বক্ষগহ্বরের সাথে আটকে থাকে। মধ্যস্তর তথা মায়োকার্ডিয়াম হৃদপেশী দিয়ে তৈরি, যা হৃদপিন্ডের প্রাচীরের সবচেয়ে পুরু স্তর। এ পেশী সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা রক্ত পাম্প করে সারাদেহে সঞ্চালন করে। অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম হৃদপিন্ডের ভিতরের আবরণ, এটা হৃদপিন্ডের অভ্যন্তরে হৃদ কপাটিকা তৈরি করে।

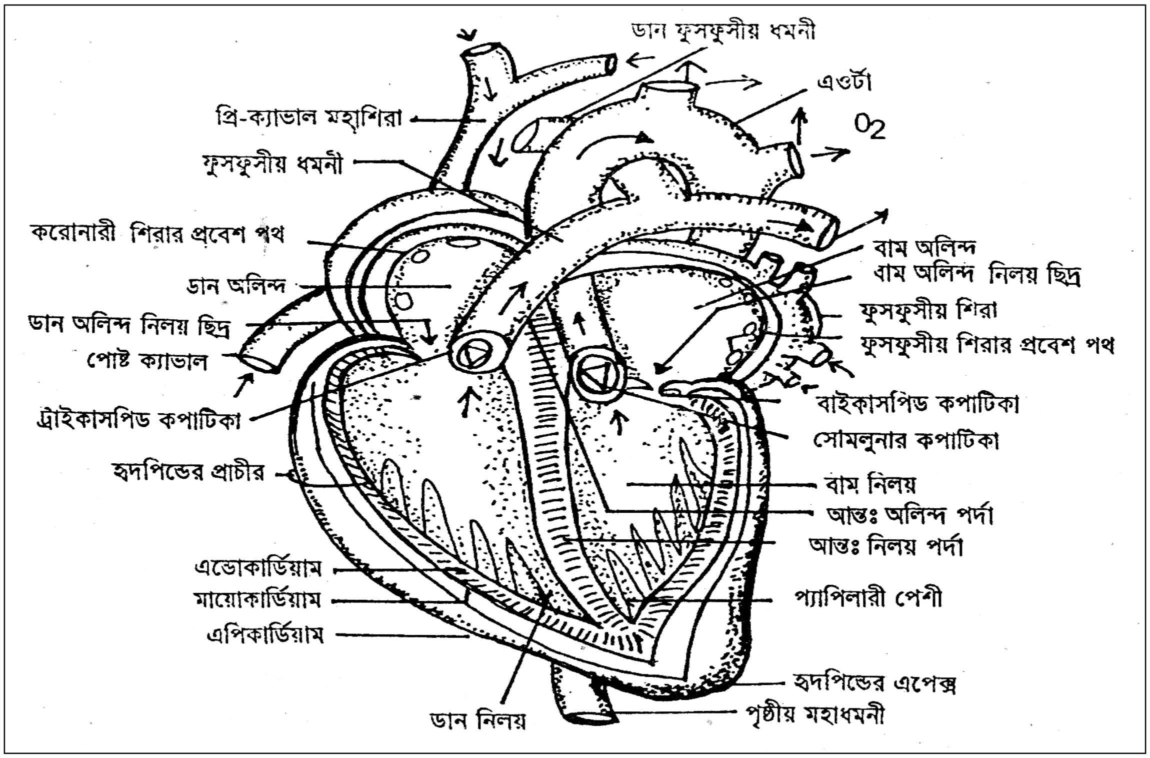

চিত্র ১৮.৬-১ : হৃদপিন্ডের লম্বচ্ছেদ

হৃদপিন্ডের ভেতরের অংশ ফাঁপা। এটি চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠগুলো নিচের প্রকোষ্ঠগুলোর চেয়ে আয়তনে ছোট। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটোকে ডান ও বাম অলিন্দ এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটোকে ডান ও বাম নিলয় বলে। অলিন্দ দুটি আন্তঃঅলিন্দ পর্দা এবং নিলয় দুটি আন্তঃনিলয় পর্দা দ্বারা পরস্পর থেকে আলাদা। ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মধ্যে ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র পথে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা থাকে। অনুরূপভাবে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যে বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথ বিদ্যমান এবং এ ছিদ্রপথ বাই কাসপিড বা দ্বি-পত্রী কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ট্রাই কাসপিড কপাটিকা ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে এবং বাই কাসপিড কপাটিকা বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে যথাক্রমে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ও অক্সিজেন যুক্ত রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। কপাটিকাগুলো একমুখী অর্থাৎ এরা নিলয় থেকে অলিন্দে রক্ত প্রবাহিত হতে দেয় না।

হৃদপিন্ডের ডান অলিন্দে উর্ধ্ব মহাশিরা (সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা) ও নিু মহাশিরা (ইনফেরিয়র ভেনাক্যাভা), বাম অলিন্দে ফুসফুসীয় শিরা এবং ডান নিলয়ে ফুসফুসীয় ধমনী ও বাম নিলয়ে মহাধমনী যুক্ত থাকে। করোনারী ধমনীর মাধ্যমে হৃদপিন্ডে রক্ত সরবরাহ হয়। ফুসফুসীয় ধমনী ও মহাধমনী মুখে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে। এজন্য রক্ত কেবলমাত্র নিলয় থেকে ধমনীতে প্রবেশ করতে পারে। অলিন্দে আগত শিরাগুলোর প্রবেশ পথে কোনো কপাটিকা থাকে না।

হৃদপিন্ডের কাজ

মানবদেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে হৃদপিন্ড পাম্প হিসেবে কাজ করে। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়।

রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হৃদপিন্ডের

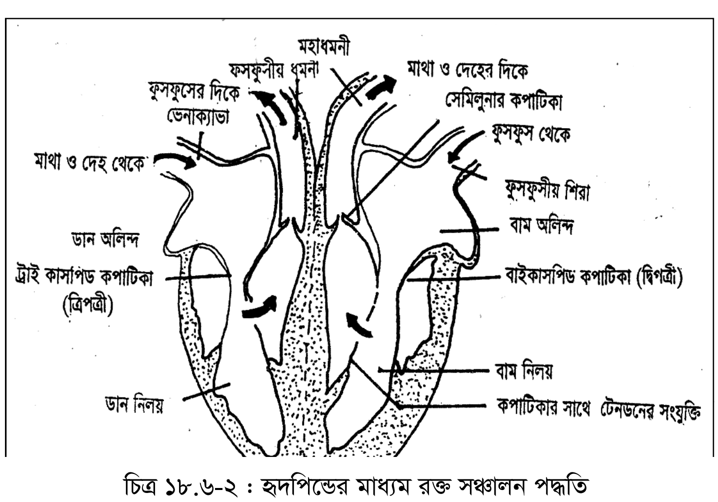

চিত্র ১৮.৬-২ : হৃদপিন্ডের মাধ্যম রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

প্রকোষ্টগুলোর অবিরামভাবে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে এদের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট পথে রক্ত প্রবাহিত থাকে। হৃদপিন্ডের সংকোচনকে সিস্টোল এবং প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। একবার সংকোচন ও প্রসারণকে একসাথে হৃদস্পন্দন বলে। সুস্থ সবল মানব দেহে প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দন ঘটে ৭২-৮০ বার; তবে অধিক পরিশ্রম করলে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। হৃদপিন্ড তার সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্তস্রোতকে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় এবং এর পাশাপাশি দেহের সর্বত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। হৃদপিন্ড প্রসারিত হলে তথা ডায়াস্টোল অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে এবং অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে ফুসফুসীয় শিরা পথে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দদ্বয় সংকুচিত হলে রক্ত ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এরপর নিলয়দ্বয় সংকুচিত হলে ডান অলিন্দ নিলয় পথে ট্রাইকাপসিড এবং বাম অলিন্দ নিলয় পথে বাইকাসপিড কপাটিকা থাকায় রক্ত নিলয় থেকে পুনরায় অলিন্দে ফেরত যেতে পারে না; রক্ত তখন ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনী পথে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনী পথে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ফুসফুসে রক্ত বিশুদ্ধ হয়। নিলয়দ্বয় সংকোচনের পরপরই পুনরায় অলিন্দদ্বয় প্রসারিত হয় এবং পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এমনিভাবে হৃদপিন্ডের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

রক্তচাপ নির্ণয় পদ্ধতি

হৃদপিন্ড থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনী প্রাচীরে যে চাপের সৃষ্টি করে তাকে রক্তচাপ বলে। হৃদপিন্ড একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (systole) এবং ডায়াস্টোল (diastole) বলে।

মানুষের রক্তচাপ প্রধানত অ্যাসকালটেটরি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।

অ্যাস্কালটেটরি বা শ্রুতিনির্ভর পদ্ধতি (auscultatory method)

উপকরণ

১. স্ফিগমোম্যানোমিটার (sphigmomanometer)

২. স্টেথোস্কোপ (stethoscope)

কার্যপদ্ধতি

১. যে ব্যক্তির রক্তচাপ নির্ণয় করা হবে তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে বা শায়িত করে তার ঊর্ধ্ব বাহুর (কনুই-এর কিছু উপরে) চারদিকে রক্তচাপ নির্ণয়ক যন্ত্রের বাহুবন্ধটিকে (cuff) টান-টান করে বেধে দিতে হবে। যন্ত্রটিকে ব্যক্তিটির হৃদপিন্ডের সমতলে রাখতে হবে।

২. এখন স্টেথোস্কোপের চেস্ট-পিসটি বাহুবন্ধনের নিচে ব্রাকিয়াল ধমনীর উপর রেখে স্টেথোস্কোপের মুক্ত প্রান্ত দুটিকে অর্থাৎ ইয়ার-পিস্ দুটিকে দুকানে লাগাতে হবে।

৩. এখন বায়ুপাম্পের স্ক্রুটি এঁটে পাম্প করে বাহুবন্ধের মধ্যে বায়ুচাপ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের ম্যানোমিটার পারদস্তম্ভ ২০০ মি.মি. পারদ চাপের সমান হয়।

৪. এখন বায়ু পাম্পের স্ক্রুটি আলগা করে ধীরে ধীরে ম্যানোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমাতে হবে এবং বিশেষ ধ্বনি শোনার অপেক্ষা করতে হবে।

৫. পারদস্তম্ভ নামার সময় প্রথম যে ধ্বনি বা শব্দ শোনা যাবে তা সিস্টোলিক রক্তচাপের নির্দেশক। এ শব্দ ধারাবাহিকভাবে কিছুক্ষণ হবার পর বন্ধ হয়ে যাবে। শব্দ বন্ধ হওয়া ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের নির্দেশক। শব্দ শুরু ও বন্ধ হবার সময় ম্যানোমিটারে পারদস্তম্ভের উচ্চতা দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

সারসংক্ষেপ

- হৃদপিন্ড দেখতে ত্রিকোনাকার। হৃদপিন্ডের চারটি প্রকোষ্ঠের উপরের দুটিকে ডান ও বাম অলিন্দ এবং নিচের দুটিকে ডান ও বাম নিলয় বলে।

- হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে জীবদেহে রক্ত সঞ্চালন চলতে থাকে।
- মানুষের রক্তচাপ অ্যাসকালটেটরি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হৃদপিন্ডের ওজন কত?
ক. ১০০ মিলিগ্রাম (প্রায়) খ. ২০০ মিলিগ্রাম (প্রায়) গ. ৩০০ মিলিগ্রাম (প্রায়) ঘ. ৪০০ মিলিগ্রাম (প্রায়)

২. মানুষের হৃদপিন্ড কয়টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত?
ক. চারটি খ. তিনটি গ. দুইটি ঘ. একটি

৩. ফুসফুসীয় শিরা কোন প্রকোষ্ঠে রক্ত দেয়?
ক. ডান অলিন্দে খ. বাম অলিন্দে গ. ডান নিলয়ে ঘ. বাম নিলয়ে

৪. কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত কোন প্রকোষ্ঠ কর্তৃক শোষিত হয়?
ক. ডান নিলয়ে খ. বাম নিলয়ে গ. বাম অলিন্দে ঘ. ডান অলিন্দে

৫. দূষিত রক্ত কোথায় বিশুদ্ধ হয়?
ক. হৃদপিন্ডে খ. ফুসফুসে গ. যকৃতে ঘ. পিত্তাশয়ে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. কঙ্কালতন্ত্র কাকে বলে? এর গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।

২. কঙ্কালের সাধারণ রোগ ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন। এ সমস্ত রোগ ও অসুবিধা থেকে মুক্তির উপায়গুলো উল্লেখ করুন।

৩. মাথার খুলির গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।

৪. মেরুদন্ডের গঠন ও কাজ আলোচনা করুন।

৫. উর্ধ্বাঙ্গের গঠন আলোচনা করুনএবং এদের কাজ উল্লেখ করুন।

৬. নিম্নাঙ্গের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।

৭. পেশীতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করুন। এর কাজগুলো উল্লেখ করুন।

৮. কঙ্কাল ও পেশীতন্ত্রের সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

৯. পৌষ্টিক নালীর চিহ্নিত চিত্র আঁকুন।

১০. পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

১১. রক্ত কি? রক্তের কাজ সম্পর্কে লিখুন।

১২. হৃদপিন্ডের গঠন বর্ণনা করুন।

১৩. রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ : ১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ : ১. খ ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ : ১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ : ১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. খ ৫. গ ৬. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ : ১. গ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ : ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. খ।